অধর মানুষ-মানুষ রতন

অমূল্যরঞ্জন ভট্টাচার্য

'মনরে খালি নামে কার্য হবে না।
মানুষ ছাড়া মানুষ ধরা কোন শাস্ত্রে শুনি না।
মানুষ ধরতে চাহ যদি মানুষ সব নিরবধি
গাছ ছাড়া ফল কোথায় পাবি বিনা গাছে ফলে না'

বাউল মেলায় বা অন্যত্র আলখাল্লা পরা সেই মানুষটি এবং তার মনের মানুষী একতারাটি আকাশের দিকে তুলে কয়েক পাক ঘুরে 'মনরে—' বলে তারসপ্তকে সুর টেনে বিস্তার করেন, আমরা দর্শকেরা উন্মনা হয়ে যাই।

বাউল!!

এই শব্দটির মধ্যেই মাদকতা মেশানো। এক রোমাণ্টিক গূঢ়তা, সুদূরের আহ্বান। এই বন্ধন থেকে মুক্তির ডাক। পথচলা উদাসী দুই জন রিক্ত নারী-পুরুষ রাতভাঙা প্রভাতের অস্পষ্টতায়, দিনান্তের বৈরাগী আভায়। আমাদের মন ছুটে যায় মানুষ ধরার' যাত্রায়। কত কথায় লেখায় বার বার ঘুরে আসে এই একটি শব্দ—

'বাউল'!!

অথচ কতটুকু জানি বা উপলব্ধি করি এই শব্দটি উচ্চারণে বা বোধে! আমাদের সীমা কিছু প্রচলিত গানে যা ব্যবহৃত হয় নাটক বা সিনেমায় বা বাউল শিল্পীদের কণ্ঠে।

কিন্তু বাউলদের সাধনা, প্রতীকী ভাষা, তত্ত্ব-দর্শন দীর্ঘ ইতিহাস, মানুষের মহামিলন এমনি অতলান্ত গভীরতা আমাদের ভাবনারও বাইরে থেকে যায়। এক অপার রহস্যময়তার অভেদ্য আবরণে প্রবহমান নির্দিষ্ট সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে, শিক্ষিত শ্রেণির কলুষিত স্পর্শের বাইরে।

বাউল সম্প্রদায়ের তত্ত্ব বিষয়ক কোন গ্রন্থ নেই। তাই বোধ হয় ব্যাখ্যাজাত কোন মতবিরোধ নেই। তত্ত্বের কোন প্রবর্তকও নেই। যা আছে সেটা হল গান। সাধারণের কাছে যা দুর্জ্ঞেয়, অবোধ্য। গবেষকের বহুধা বিশ্লেষণের পরেও বাউলের মুখে থাকে রহস্যময় হাসি, চোখে বিদ্যুৎরেখা। শেষ বিচারে সেই গানের কলিটি শুনতে পাওয়া যায়—'তারে ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি।'

সুতরাং বাউল সম্পর্কিত আমাদের এই লেখাটিও এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। তবুও লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অতি বিশিষ্ট উপাদান হিসেবে অতি সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য দেওয়ার প্রয়াস করা হল।

‘বাউল’ শব্দের ও সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

অনেক মত প্রচলিত এ বিষয়ে। কেউ কেউ বলেন এটি প্রাকৃত বাউল শব্দ যায় অর্থ এলোমেলো, পাগল ইত্যাদি।

কারো মতে সংস্কৃত ‘বাতুল’ শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ ‘পাগলের দল’। বাউলের প্রায় সমার্থক ‘আউল’ শব্দটি এসেছে আরবি প্রতিশব্দ ‘আউলিয়া’ থেকে যার অর্থ হল প্রকৃত সাধক। হিন্দিতে বাউল শব্দটির দ্যোতক ‘বাউরা’ যার অর্থ ‘সাধক পাগল।’

বাউলরা যে ভাবোন্মাদ সেটা তাদের গানেই আছে—

‘ও যে কভু আপন মনে হাসে,
আবার কখনও বা করে রোদন।
ও তার হস্তগত সুখের চাবি
তবু করে না সুখ অন্বেষণ।”

বাউল দর্শন মূলত মিশ্র দর্শন। এই দর্শনের উপর বৌদ্ধ, হিন্দু, সুফি দর্শনের প্রভাব পড়েছে। বাউলদের উদ্ভবকাল ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী।

বাংলায় পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধপন্থী। চর্যাপদ রচিত হয়েছিল বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের হাতে। সহজিয়ারা ছিল সংখ্যাগুরু। তথাপি বৌদ্ধ মহাযানপন্থীদের কাছে তারা অবজ্ঞার পাত্র ছিল।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর সকল অনুগামী নির্বাণের পদ্ধতি নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়। বৈশালী নগরে মহাসম্মেলন হয় যা ইতিহাসে ‘সাঙ্গীতি’ নামে পরিচিত। এই বৈশালী নগরে দ্বিতীয় সাঙ্গীতিতে বৌদ্ধ ধর্ম দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এক দলের মত জগতের সমস্ত প্রাণীর মুক্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তির নির্বাণ লাভ করা হবে না। এই শাখাই ‘মহাযান’। অপর দলের মতে জগতের সকলের নির্বাণ-লাভের প্রয়োজন নেই। নিজের নির্বাণ-লাভই শ্রেয়। এই শাখাই ‘হীনযান’।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম আরও কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়—যার মধ্যে অন্যতম ‘সহজযান’ ও ‘কালচক্রযান’।

এই সহজিয়ারাই চর্যাপদ সৃষ্টি করেন। সহজিয়ারা দেহকেন্দ্রিক সাধনা দ্বারা নির্বাণলাভের পক্ষপাতী ছিলেন। সহজিয়ারা ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ। বাদ্যকর, ধনুকার, মুচি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির মানুষেরা ছিল চর্যাপদের গীতিকার। চর্যাপদের রচয়িতা আর বাউলেরা উভয়েই ছিল সমাজের নিম্ন পেশার মানুষ।

বাংলায় পাল রাজত্বের পর সেন শাসন আরম্ভ হয়। সেনেরা ছিল হিন্দু ধর্মের

পৃষ্ঠপোষক। নিম্নবর্ণের বৌদ্ধরা নানাভাবে হিন্দুদের মাঝে মিশে যেতে থাকে কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দু হতে পারে না।

এদিকে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে — ইসলাম ধর্মের আগমন।

বঙ্গবিজয়ের পূর্বে ও পরে মধ্যপ্রাচ্য ও তার সন্নিহিত অঞ্চল থেকে পীর ফকিরেরা ইসলামের সাম্যবাদ নিয়ে বর্ণপ্রথায় বিভাজিত ভারতে প্রবেশ করে। ইসলামের সাম্যবাদ অন্ত্যজ শ্রেণির হিন্দু ও বৌদ্ধদের আকর্ষণ করে এবং বিপুল সংখ্যক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ধর্মান্তরিত হল ঠিকই কিন্তু তারা মুসলমান উচ্চশ্রেণি—শেখ, সৈয়দ, পাঠানদের মতো হতে পারল না। সেই বঞ্চিত, নিন্দিত অন্ত্যজ হয়ে রইল। তাদের আচার আচরণে পূর্বের হিন্দু, বৌদ্ধ ধারার সঙ্গে নব্য ইসলামের আচার আচরণ মিশে এক মিশ্র ভাবধারায় গড়ে উঠে।

শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনায় জর্জরিত এই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং ধর্মের মূল স্রোত থাকে বিছিন্ন হয়ে যায়। স্বাধীন মানবিকতা ভাব জাগ্রত হয়। এই মানবিকতাবাদীদের মত হল 'স্রষ্টা মন্দিরে-মসজিদে নাই। তিনি আছেন মানুষের হৃদয়ে'।

এই মতবাদের অনুসারীরাই এই বাংলায় বাউল ও ওপার বাংলায় ফকির অর্থাৎ বাউল ফকির নামে পরিচিত।

সর্বধর্মের মিলনে মিশ্রণে বাউল দর্শন এক উচ্চ মানবিকতাবাদ—গভীরতায় ও ব্যাপকতায়। উচ্চনীচ শ্রেণিহীন, জাতপাতহীন এক অবিভক্ত সমাজ বাউলদের। সেই যে লালন সাঁইয়ের গান—

'জাত গেল জাত গেল বলে
এফি আজব কারখানা
সত্য পথে কেউ নয় রাজি
সবাই দেখি তা না না না।'

বাউল গানে "মানুষ"

চণ্ডীদাসের পদে আমরা তিন জন মানুষের সন্ধান পাই—'অযোনী', 'সহজ' ও 'সংস্কার' মানুষ। অযোনী মানুষ বলতে নিষ্কাম বা নারীত্যাগী সন্ন্যাসী বুঝায়। সংস্কার মানুষ অর্থে ত্রিতাপদগ্ধ সাধারণ মানুষ। আর সহজ মানুষ অর্থে নারী-পুরুষের মিলন-রস সাধক সহজিয়াদের বোঝায়।

এই তিন রকম মানুষের পরে এক মানুষ আছে। সে হল 'অধর মানুষ'। এই মানুষই বাউল গানে বিভিন্ন নামে আসে—অজান মানুষ, বিরূপ মানুষ, আলোক মানুষ, মীনরূপ নীরে নিরঞ্জন, রসের মানুষ, মনের মানুষ ইত্যাদি।

'বাউল' শব্দের ও সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

অনেক মত প্রচলিত এ বিষয়ে। কেউ কেউ বলেন এটি প্রাকৃত বাউল শব্দ যায় অর্থ এলোমেলো, পাগল ইত্যাদি।

কারো মতে সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ 'পাগলের দল'। বাউলের প্রায় সমার্থক 'আউল' শব্দটি এসেছে আরবি প্রতিশব্দ 'আউলিয়া' থেকে যার অর্থ হল প্রকৃত সাধক। হিন্দিতে বাউল শব্দটির দ্যোতক 'বাউরা' যার অর্থ 'সাধক পাগ্‌ল।'

বাউলরা যে ভাবোন্মাদ সেটা তাদের গানেই আছে—

'ও যে কভু আপন মনে হাসে,
আবার কখনও বা করে রোদন।
ও তার হস্তগত সুখের চাবি
তবু করে না সুখ অন্বেষণ।"

বাউল দর্শন মূলত মিশ্র দর্শন। এই দর্শনের উপর বৌদ্ধ, হিন্দু, সুফি দর্শনের প্রভাব পড়েছে। বাউলদের উদ্ভবকাল ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী।

বাংলায় পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধপন্থী। চর্যাপদ রচিত হয়েছিল বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের হাতে। সহজিয়ারা ছিল সংখ্যাগুরু। তথাপি বৌদ্ধ মহাযানপন্থীদের কাছে তারা অবজ্ঞার পাত্র ছিল।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর সকল অনুগামী নির্বাণের পদ্ধতি নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়। বৈশালী নগরে মহাসম্মেলন হয় যা ইতিহাসে 'সাঙ্গীতি' নামে পরিচিত। এই বৈশালী নগরে দ্বিতীয় সাঙ্গীতিতে বৌদ্ধ ধর্ম দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এক দলের মত জগতের সমস্ত প্রাণীর মুক্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তির নির্বাণ লাভ করা হবে না। এই শাখাই 'মহাযান'। অপর দলের মতে জগতের সকলের নির্বাণ-লাভের প্রয়োজন নেই। নিজের নির্বাণ-লাভই শ্রেয়। এই শাখাই 'হীনযান'।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম আরও কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়—যার মধ্যে অন্যতম 'সহজযান' ও 'কালচক্রযান'।

এই সহজিয়ারাই চর্যাপদ সৃষ্টি করেন। সহজিয়ারা দেহকেন্দ্রিক সাধনা দ্বারা নির্বাণলাভের পক্ষপাতী ছিলেন। সহজিয়ারা ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ। বাদ্যকর, ধনুকার, মুচি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির মানুষেরা ছিল চর্যাপদের গীতিকার। চর্যাপদের রচয়িতা আর বাউলেরা উভয়েই ছিল সমাজের নিম্ন পেশার মানুষ।

বাংলায় পাল রাজত্বের পর সেন শাসন আরম্ভ হয়। সেনেরা ছিল হিন্দু ধর্মের

পৃষ্ঠপোষক। নিম্নবর্ণের বৌদ্ধরা নানাভাবে হিন্দুদের মাঝে মিশে যেতে থাকে কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দু হতে পারে না।

এদিকে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে — ইসলাম ধর্মের আগমন।

বঙ্গবিজয়ের পূর্বে ও পরে মধ্যপ্রাচ্য ও তার সন্নিহিত অঞ্চল থেকে পীর ফকিরেরা ইসলামের সাম্যবাদ নিয়ে বর্ণপ্রথায় বিভাজিত ভারতে প্রবেশ করে। ইসলামের সাম্যবাদ অন্ত্যজ শ্রেণির হিন্দু ও বৌদ্ধদের আকর্ষণ করে এবং বিপুল সংখ্যক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ধর্মান্তরিত হল ঠিকই কিন্তু তারা মুসলমান উচ্চশ্রেণি—শেখ, সৈয়দ, পাঠানদের মতো হতে পারল না। সেই বঞ্চিত, নিন্দিত অন্ত্যজ হয়ে রইল। তাদের আচার আচরণে পূর্বের হিন্দু, বৌদ্ধ ধারার সঙ্গে নব্য ইসলামের আচার আচরণ মিশে এক মিশ্র ভাবধারায় গড়ে উঠে।

শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনায় জর্জরিত এই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং ধর্মের মূল স্রোত থাকে বিছিন্ন হয়ে যায়। স্বাধীন মানবিকতা ভাব জাগ্রত হয়। এই মানবিকতাবাদীদের মত হল 'স্রষ্টা মন্দিরে-মসজিদে নাই। তিনি আছেন মানুষের হৃদয়ে'।

এই মতবাদের অনুসারীরাই এই বাংলায় বাউল ও ওপার বাংলায় ফকির অর্থাৎ বাউল ফকির নামে পরিচিত।

সর্বধর্মের মিলনে মিশ্রণে বাউল দর্শন এক উচ্চ মানবিকতাবাদ—গভীরতায় ও ব্যাপকতায়। উচ্চনীচ শ্রেণিহীন, জাতপাতহীন এক অবিভক্ত সমাজ বাউলদের। সেই যে লালন সাঁইয়ের গান—

'জাত গেল জাত গেল বলে
এ়কি আজব কারখানা
সত্য পথে কেউ নয় রাজি
সবাই দেখি তা না না না।'

বাউল গানে "মানুষ"

চণ্ডীদাসের পদে আমরা তিন জন মানুষের সন্ধান পাই—'অযোনী', 'সহজ' ও 'সংস্কার' মানুষ। অযোনী মানুষ বলতে নিষ্কাম বা নারীত্যাগী সন্ন্যাসী বুঝায়। সংস্কার মানুষ অর্থে ত্রিতাপদগ্ধ সাধারণ মানুষ। আর সহজ মানুষ অর্থে নারী-পুরুষের মিলন-রস সাধক সহজিয়াদের বোঝায়।

এই তিন রকম মানুষের পরে এক মানুষ আছে। সে হল 'অধর মানুষ'। এই মানুষই বাউল গানে বিভিন্ন নামে আসে—অজান মানুষ, বিরূপ মানুষ, আলোক মানুষ, মীনরূপ নীরে নিরঞ্জন, রসের মানুষ, মনের মানুষ ইত্যাদি।

যে নামেই হোক এই 'অধর মানুষ'-ই সাধন বস্তু এবং অসংখ্য গানে তার গুণকীর্তন করা হয়েছে। লালন শা'র মানুষ তত্ত্ব এই গানে—

'ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন
কিসে চিনবিরে মানুষ রতন।।
আপন খবর নাই আপনারে
বেড়াস পরের খবর করে।
আপন খবর জানলে পরে
পরকে চেনা যায় তখন।'

'ঠিকের ঘরে' অর্থাৎ সংসারে আমি এসেছিলাম একজন 'মানুষ'-কে ধরে। কে সেই 'মানুষ'। মানুষের জন্মমূল সেই 'শুক্রকীটরূপী মানুষ' 'ডিম্বানুরূপিনী' অপর এক মানুষকে ধরে। সেই মানুষটিই বাউল সহজিয়া সাধনার মুখ্য মানুষ 'অধর মানুষ'।

বাউলদের মতো বৈষ্ণবদেরও সহজিয়া অর্থাৎ দেহকেন্দ্রিক সাধনা আছে। তাদের গানে ও কীর্তনে গৌরাঙ্গ, নিতাই, কৃষ্ণ রাধা নামগুলি রূপক রূপে ব্যবহার করেছেন। বাউল ধর্মে কোন রোজা, পূজা নেই। নেই কোন স্তব, আরতি। এই দেহগত জীবন সাধন পরমের সাধনা—'ভান্ডেতে ব্রহ্মান্ড আছে জানতে পারলে হয়'।

পরলোকে আস্থাহীন বাউলেরা জীবনের সকল দেনাপাওনা এখানেই পেতে চেয়েছেন। ওমর খৈয়ামের মতো লালনও তাই বলছেন—

'মলে পাব বেহেস্ত খানা
তা শুনে আর মন মানে না।'

বাউল গান ও মর্মবাণী

বাউল গানগুলি নানা অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গে বাউল সম্প্রদায় ফকির নামে পরিচিত এবং তাদের গানগুলি 'মারফতি' বা 'মুর্শিদা' গান নামে অভিহিত। উত্তরবঙ্গে বাউল গানগুলি 'দেহতত্ত্বের গান' নামে পরিচিত।

বাউল গান বিভিন্ন প্রভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে যোগ, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব ও সুফী প্রভাব অধিকতর।

বাউলেরা পাগল। তবে মস্তিষ্ক বিকৃত অর্থে নয়। তারা ভাবের পাগল, প্রেমে উদাস, মর্মে উন্মাদ। তাদের ক্ষুধিত হৃদয়, ব্যথিত প্রাণ অজ্ঞাত অধ্যাত্ম মর্মের সন্ধান পেতে চায়। এই উন্মুখতা তাদের গৃহছাড়া করেছে, উদাসী বৈরাগী করেছে। এ এক দহন জ্বালা—

'আসার আগে সাঁই দরদী আর কতদিন রব?
দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াই, আর বা কোথায় যাব?
যার জন্যে হয়েছি পাগল, তাকে কোথায় পাব?
মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, তারে কি দিয়ে নিবাব?'

এইভাবে বাউলেরা আপন মর্মের তাড়নায় হৃদয়ের দাব-দাহন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অজ্ঞাত 'অনামকের' সন্ধানে। এই 'অনামক' তাদের মর্মে নিত্য আসা যাওয়া করে অথচ অধরা। এ যেন নিজের ছায়া আলিঙ্গন করার ব্যর্থ-প্রয়াস। বাউলেরা এই অজ্ঞাত 'অনামক'-কে পরিজ্ঞাত করতে চায়, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে নিজের করে রাখতে চায়। কিন্তু পারে না। রহস্যময় লুকোচুরি খেলায় সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেয়ে চলে একতারার সুরে—

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ী দিতাম তাহার পায়।"

এই নিয়ত অন্বেষণ বহির্জগত থেকে ক্রমশ চলে আসে অন্য এক গোপন জগতে। বাউলের গানে সেই খবর—

'আছে তোরই ভিতর অতল সাগর
তার পাইলি না মরম।
তার নাই কূলকিনারা শাস্ত্রধারা
নিয়ম কি রকম।।"

সেহ অজ্ঞাত অনামককে ধরতে গেলে ডুব দিতে হবে হৃদসাগরে। শাস্ত্র, নিয়ম প্রয়োজন নেই। আপন মর্মে হারাতে হবে নিজেকে—

'কারে বল্‌ব কেবা করে না প্রত্যয়,
আছে এই মানুষে সত্য, নিত্য চিদানন্দময়।'

বাউলেরা যার জন্য পাগল তাকে সন্ধান করে এই দেহেই। অর্থাৎ বাউলেরা মানুষকেই দরদী 'সাঁই'য়ের প্রতীক বলে ধরে রাখে। এইখানেই 'অচিন পাখি', এইখানেই তাদের মনের 'দরদী সাঁই' আছেন। ডাকলে কথা বলা যায়—'দেহের মাঝে আছে যে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়।'

তাই দেহের সৃষ্টি কৌশল নিয়ে বাউলেরা গান করে। এই গানগুলিকে 'দেহতত্ত্বের গান' বলা হয়। মুর্শিদা গানেও দেহতত্ত্বের বিষয় আছে।

যেহেতু বাউল তত্ত্ব দেহকেন্দ্রিক এবং তাদের 'মনের মানুষ' বা 'অনামক' এই দেহেই স্থিত তাই তারা মন্দির, মসজিদ বা কোন বাহ্যিক পূজা করে না। এই সাধনতত্ত্বের উৎসে যেতে হবে।

বাউল তত্ত্বে ও গানে 'সহজিয়া' প্রভাব

অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজত্বের সময় বৌদ্ধ সহজিয়া দর্শন প্রসারিত হল। চর্যাপদের রচয়িতা সিদ্ধাচার্যগণ তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের জাতপাত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। এই সিদ্ধাচার্যগণ একেবারে সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম ছিলেন। কিন্তু বাঙলায় যে লোকায়ত সহজিয়া দর্শন গড়ে উঠেছিল সেটা বাধাপ্রাপ্ত হল পরবর্তী দুই শতাব্দীতে—একাদশ থেকে ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দে কর্নাটক থেকে আগত সেন বংশের রাজত্বকালে যাঁরা ছিলেন হিন্দু দেবদেবীর উপাসক। এই সময় থেকে সহজিয়া ঐতিহ্য দুটি ধারায় প্রবাহিত হল—সগুণ ও নির্গুণ।

বৈষ্ণব সহজিয়া প্রকাশ ঘটল সগুণ ভক্তিবাদের ভাবধারায় যার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব ও চণ্ডীদাস। আর নির্গুণ সহজ পথের পথিক হলেন বাংলার বাউল ও উত্তর ভারতের সন্ত সাধকেরা। সন্ত-সাধকদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন কবীর ও তাঁর শিষ্য দাদু ও নানক। তাঁদের উত্তরাধিকার হিন্দু ও মুসলিম সমন্বয়ে। সেই ঐতিহাসিক উত্তরণ সাধিত হল নির্গুণ-সহজিয়া ঐতিহ্যের সঙ্গে সুফি দর্শনের পারস্পরিক সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ায়। বাংলার বাউল ও উত্তর ভারতের সন্ত কবিরা ধর্মীয় সমন্বয়ের গান গাইলেন এবং মন্দির মসজিদের গোঁড়ামি ও জাতপাতের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নিলেন। বাংলার সহজিয়া বাউল গাইলেন—

'ও তোর কিসের ঠাকুরঘর?
যারে ফাটকে তুই রাখলি আটক
তারে আগে খালাস কর?'

সহজিয়া দর্শন ও বাউল দর্শনের মূল কথা হল 'উজান-সাধন।' প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকেরা যে পথে চলে 'পাগল' বাউল চলে বিপরীত পথে। বাউল তাই নিজেকে বলে—উল্টা নাও বাইতে। এই উজানে যাওয়ার উদ্দেশ্য হল স্বরূপে প্রত্যাবর্তন। সহজ অর্থাৎ সহজাত সত্যস্বরূপ, রূপ থেকে অরূপে, অমৃত-স্বরূপে উজান সাধনে যাওয়া। আত্মোপলব্ধি। এই সাধনে প্রয়োজন নেই মন্দির-মসজিদ, ব্রাহ্মণ-মোল্লার।

চর্যাপদের সাধকেরা এই উজান সাধনের অনুষঙ্গ করেছেন দেহরূপ নৌকা ও জন্মমৃত্যুর ভবসাগর। ইন্দ্রিয়সুখের বিপরীতে নাও বাওয়া—

'নৌবাহী নৌকা টান অ গুণে।
মেলি মেলি সহজে জাউ ণ আনে।।'

সহজিয়া বাউলের গানে—

'অনুরাগী রসিক যারা
যাচ্ছে তারা উজান বাঁকে।'

আত্মোপলব্ধির সাধনায় সহজিয়াদের মতে কোন তত্ত্বই দেহের বাইরে অবস্থিত নয়। এই বীক্ষণটি বৈষ্ণব সহজিয়া, সন্ত সাধক ও বাউলদের দর্শনে সমভাবে বিরাজমান। বাউল গানে—

'আদ্য অন্ত এই মানুষে
বাইরে কোথাও নাই।'

বাউল তত্ত্বে সুফী প্রভাব

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ইরান থেকে সুফী ধর্মাবলম্বী পীর-ফকিরদের আনাগোনা শুরু হয়। তাঁরা একধরনের প্রেমাশ্রিত ও আবেগমূলক সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন যাঁদের সঙ্গে পরবর্তীকালে বাউল ও বৈষ্ণব সাধনার সাদৃশ্য ছিল।

বৈষ্ণব ধর্মে যেমন দয়িত-দয়িতার সাধনা তেমনি ইরানীয় সুফী সম্প্রদায়েও ঈশ্বর ও ভক্তকে প্রেমিক-প্রেমিকারূপে মানবীয় রসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রেমে উন্নীত হওয়ার সাধনক্রম প্রচলিত ছিল। সুফী ধর্মে ঈশ্বর প্রেমিকা অর্থাৎ 'আসেফ' আর ভক্ত হলেন প্রেমিক বা 'মাশুক'। বৈষ্ণব ভাবনার বিপরীত। সুফী-সাহিত্যে লায়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ প্রভৃতি মর্ত্য মানুষের রূপকে ঈশ্বর প্রেম ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করা হয়েছে। সুফী ধর্মের শুরু দ্বৈতবাদে, সমাপ্তি অদ্বৈতবাদে যখন ভক্ত ঈশ্বরে লীন হয়ে যায়। প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছিন্নবোধ থাকে না। যেমন রায় রামানন্দের সেই গানের মতো—

'ন সো রমন, ন হাম রমণী'

অর্থাৎ সীমাবদ্ধ অহং-এর পূর্ণ বিলুপ্তি।

সুফী সাধকগণ ঈশ্বর সাধনার গান গাইতেন, আবিষ্ট হয়ে মূর্ছিত হতেন। আকবরের সভায় এই সুফী সমাবেশের নৃত্য ও মূর্ছার ছবি আঁকা হয়েছিল। ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে এই চিত্রটি 'দ্য ড্যান্স অফ দরবেশ' নামে পরিচিত।

ইসলামের শরিয়তী বিধি নয়, হাদিস নয়, কোরানের বাণী নয়—শুধু আবেগঘন প্রেমের বাণী একদল সাধককে আবিষ্ট করেছিল—এঁরাই সুফী।

ইসলামে ধর্মান্তরী বাঙালী হিন্দুরা এমনকি বাঙালী হিন্দু সমাজের বৃহত্তর অংশ এই পীর-ফকির সুফীদের আলৌকিক প্রভাবে দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ভাবগত সাদৃশ্য ছিল বলেই সহজিয়া বাউল সম্প্রদায়ের ভাবধারায় সুফীদের প্রভাব ঘটেছিল।

শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল থেকে পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে সুফী সাধনার ধারা বাঙালীকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল। বৈষ্ণব ধর্ম ও সুফীদর্শনের উৎস যে এক—মানবপ্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রেমে আলোকিত হওয়া উভয়েরই সাধ্য সাধন তত্ত্ব।

গানই বাউলের প্রাণ। এই গানেই তাদের তত্ত্ব, দর্শন, সাধন প্রকাশিত। বাউলেরা যে অজ্ঞাত মর্ম, দরদী সাঁই, অচিন পাখি বা মনের মানুষের সন্ধানে পাগল হয় সেটা সুফীদের 'ঘয়র' বা অজ্ঞাত বস্তুর সন্ধানই। তফাৎ শুধু এই— বাউলের উচ্ছ্বাসগুলি বাঙলাদেশের ভিজা মাটির গন্ধ আর সুফীদের উচ্ছ্বাসে আরব, পারস্যের মন উঁকিঝুঁকি দেয়। কিন্তু বাঞ্ছিত বস্তু এক এবং অভিন্ন। উভয়েরই সৃষ্টি থেকে স্রষ্টাকে উপলব্ধির প্রয়াস—

'আমি মন পাইলাম, মনের মানুষ পাইলাম না।
আমি তারি মধ্যে আছি, মানুষ তাহা চিনেও চিনল না।"

আবার

'এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন, পারলাম না চিনতে।'

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অজ্ঞাত মানুষ, অজ্ঞাত মানুষের মধ্যে পৃথিবীর মানুষ। স্রষ্টা ও সৃষ্টি একাকার। ভারতীয় সুফীদেরও এই একই দর্শন যাকে প্যান্থিইজম্' বা বিশ্ব ব্রহ্মবাদ বলা হয়। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সবই ব্রহ্ম—'সর্বৈব ব্রহ্ম'। বাউল গানে—

'আমি হৈতে আল্লা রসুল
আমি হৈতে কুল
আমি হৈতে আসমান জমিন
আমি হৈতে ভুল।'

সংসারের অনিত্যতা সুফী ও বাউলদের সমভাবে মরমিয়া বা মর্মবাদী করে ঘর ছাড়া করেছে। মুসলমানদের মধ্যে সুফীরাই একমাত্র উদাসী সম্প্রদায়।

বঙ্গ বৈষ্ণব ও সুফীদের বিশাল প্রভাবের ফলে বাউলদের মধ্যে গুরুবাদ প্রবেশ করে। যেমন এই গানে—

'শুনরে অজ্ঞান মন,
ভজ গুরুর শ্রীচরণ,
গুরু বিনে কে আছে আপন'

বাউলের সাধনা

বাউলের সাধনা নারী-পুরুষের যুগল দেহসাধনা। গুরু বা মুর্শিদ পদ্ধতি নির্দেশ করেন। এই সাধনার উদ্দেশ্য কাম থেকে প্রেমে উত্তরণ এবং আনন্দে আবিষ্ট থাকা। এই সাধনা কোন দেবদেবী নির্ভরতা নয়। নরনারীর বাস্তব শরীর নির্ভর, বস্তু নির্ভর—পিতৃ বস্তু ও মাতৃ বস্তু। তাই বাউল বলে—সবার উপরে মানুষ সত্য'।

'যে বস্তু জীবনের কারণ
তাই বাউল করে সাধন'।

সাধন পদ্ধতি সর্ব ধর্মেই অতীব গোপনীয়। বাউল সাধনাও অতীব জটিল—'চারি চন্দ্রভেদ', 'চরণদাসী', 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' প্রভৃতি বহু রূপক ভাষায় এই সাধনা চলে গুরুর আশ্রয়ে গোপনে। নির্দেশ আছে—'আপন সাধন কথা না কহিও যথা তথা'।

সুতরাং আমরাও এই প্রসঙ্গ আলোচনা থেকে বিরত হলাম।

সব শেষে

জাতপাতহীন, কুসংস্কার বর্জিত, উচ্চনীচের বিভেদহীন সহজিয়া বাউল দর্শন, সুফীধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার কোমল মাটি, মননে, চিন্তনে, জীবনচর্চার প্রাণশক্তি। প্রেম ও মানবিকতা এই ত্রয়ীর আকাঙ্খিত বস্তু। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সার্বিকভাবে বাউল, বৈষ্ণব ও সুফী প্রভাব এত গভীরে মিশে আছে যে কার্যত তার বিশ্লেষণ কঠিন প্রয়াস। রবীন্দ্র সাহিত্যে এই তিন ধারার গভীর প্রভাব আছে। সেটা অন্য এক বিস্তৃত বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সহজিয়া বাউলদের 'মনের মানুষ' দর্শনে। তাঁর 'মানুষের ধর্ম' লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করি—

'মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকে পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরে বিক্ষিপ্ত, আপনহারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলাম বাউল ভিখারির মুখে—

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখে শুনেছিলাম—'তোর ভিতর অতল সাগর'। সেই পাগলই গেয়েছিল—

"মনের মধ্যে মনের মানুষ কর অন্বেষণ।" ❑

(লেখক একজন বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক)